BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04020028

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 02 | February 2026 | e-ISSN: 2584-1890

একজন 'হিজড়ে'র আত্মকথন: একটি পর্যালোচনা

Dr. Puja Karmakar

Email: pujakarmakar7492@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

বাংলা কথাসাহিত্যে যৌন সংখ্যালঘু মানুষের কথা নানাভাবে উঠে এসেছে। পুরুষ সমকামী, নারী সমকামী, পুরুষালী নারী অথবা নারীসুলভ পুরুষ, রূপান্তকামী নারী ও রূপান্তকামী পুরুষ ইত্যাদি সূক্ষ্ম যৌনতার স্তরগুলি চরিত্রের আধারে বাংলা কথাসাহিত্যে নানাভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এই আখ্যানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিষমকামী শিশ্ন-যোনি সম্পর্ক নির্মিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমাজকাঠামোয় যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মপরিচয়গত দ্বন্দ্ব ও সংকট তুলে ধরা। হিজড়ে সম্প্রদায়কে আমরা সাহিত্য ও বাস্তবতা উভয়ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছি অন্যান্য রূপান্তরকামী মানুষদের তুলনায় হিজড়ে সমাজের মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে একরকম দুঃসাহসিকতা আছে। এই দুঃসাহসিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য হিজড়ে সমাজের নিজস্ব মৌলিক সমাজব্যবস্থা ও জীবনযাপন থেকে প্রাপ্ত। পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু তথাকথিত মূলস্রোতের সমাজকে তোয়াক্কা না করে নারীসত্তাকে প্রকাশ্যে এনে এরা বেশি করে দৃশ্যমান হয়েছে। বিষমকামীর চোখে তথাকথিত রুচিহীন সংস্কৃতিহীন মানুষগুলি যেভাবে মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তিকে উলঙ্গ করেছে তাতে ভদ্রলোক সমাজের চক্ষুশূল হবে বই কি! এত দৃশ্যমান হওয়ার শাস্তিস্বরূপ সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক সমাজ 'হিজড়ে' শব্দটিকেই আলাদা করে গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। সমাজ সংস্কৃতি ও কথাসাহিত্যের জগতের অনেক স্থানেই মেয়েলি আচরণ করা পুরুষকে 'হিজড়ে' সম্বোধন করে গালিগালাজ করার দৃষ্টান্ত আছে। যদিও সম্পূর্ণ হিজড়ে সমাজ নিয়ে রচিত কবিতা, উপন্যাস কিংবা নাটকের সংখ্যা নিতান্তই কম। না-পুরুষ না-নারীর রহস্যময়তা দেখাতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকরা হিজড়েদের জন্মগত পরিচয়ের দিকটি নিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। সাধারণের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো ঔপন্যাসিক হিজড়েদের 'উভলিঙ্গ' করে তুলে ধরেছেন। বাংলায় হিজড়ে বিষয়ক প্রথম সার্থক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা করেন মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান আলোচনায় আমরা কোনো উপন্যাসের আখ্যান নয়, সরাসরি একজন 'হিজড়ে' পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের বয়ানে তাঁর আত্মজীবনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে চেয়েছি, তা হল তামিল ভাষায় লেখা A. Revathi-র Unarvum Uruvamum, এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ২০১০ সালে প্রকাশ করেন V. Geetha, যার নাম The Truth About Me – A Hijra Life Story। এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে হিজড়ে সম্প্রদায়ের যৌনতা, মৌলিক সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থান, রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান, মৌলিক দেব-দেবীসহ একটি সার্বিক ধারণা পেতে পারি, যা হিজড়েদের জীবন ও সমাজ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দসূচক : *নির্বাণাম, গুরুমা, যৌনপেশা, বহুচেরা, ইরাবান।*

মূল আলোচনা:

তামিলনাড়ুর সালেম জেলার নামাক্কাল তালুক গ্রামে জন্মেছিলেন ডোরাইসামি ওরফে রেভাথি। মারিয়াম্মা আর বিনায়কার মন্দির দিয়ে এই গ্রামের পথ শুরু। গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে 'Upper Class' আর গ্রামের প্রান্তে বসবাস করে 'Lower Class' -এর মানুষেরা। ডোরাইসামিদের 'চাক্কলি' ঘরের বাচ্চাদের ছোঁয়া বারণ। শুধুমাত্র চাষাবাদের কাজে মানুষ কম পড়লে 'চাক্কলি'

ঘরের ছেলে মেয়েদের ডাক পড়ত গ্রামের প্রান্ত থেকে। মন্দির চত্বরে এদের প্রবেশ নিষেধ। গ্রামের বাচ্চাদের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে, এরপর সাইকেল চালিয়ে তিন কিলোমিটার পথ যেতে হয় নামাক্কাল সদর শহরের স্কুলে। তিন দাদা আর এক দিদির পর ডোরাইসামি জন্মায় পুত্র সন্তান হয়ে। বাবা দুধ ব্যবসায়ী, ট্রাকে করে দুধ পৌঁছে দিতে হয় শহরে। এইরকম একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে পুত্র সন্তান হয়ে জন্মানো ডোরাইসামির রেভেথি হয়ে ওঠার কাহিনি *Unarvum Uruvamum*।

নামাক্কাল শহর থেকে বেশ কিছু দূরে ডিন্ডিগুল শহরে একদল এমন মানুষকে খুঁজে পেয়েছিল ডোরাইসামিরা - যাদের একজন 'আম্মা' আছে। এই আম্মার অনেক সন্তান যারা ডোরাইদের মতো পরিবার থাকতেও আশ্রয়হীন। প্রতি বছর জুলাই মাসের পনের তারিখ থেকে আগস্ট মাসের পনের তারিখ পর্যন্ত পালিত হয় 'আম্মাম' উৎসব। দিল্লি ও মুম্বই থেকে এই উৎসবে যোগ দিতে ঘরে ফেরে আম্মার সন্তানেরা, ডোরাইসামি ঠিক করেছে এই মানুষগুলোর কাছে গিয়ে দেখা করবে। টিউশন পড়ার টাকা দিয়ে সে কিনেছে চুড়ি, চুলের ফিতে আর কানের দুল, বাড়ি থেকে লুকিয়ে এনেছে বোনের সায়া ব্লাউজ আর শাড়ি। ডিন্ডিগুলের আম্মাম উৎসবে যাওয়ার জন্য ডোরাইসামির বন্ধুরা এতখানিই উত্তেজিত যে বাসের মধ্যেই তারা স্নো পাওডার লিপস্টিক ইত্যাদি নানা প্রসাধনে ভেতরের নারীসত্তাকে প্রকাশ্যে আনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ডোরাইসামি ভাবে "I wanted to live as a woman, at the same time I knew that I would have to live in fear of what people thought and said."[১] আম্মার কাছে গিয়ে ডোরাইসামির মনে হয়েছিল এখানকার মানুষগুলো যেন প্রত্যেকেই পূর্ণাঙ্গ নারী, মুহূর্তে মায়ের মতো কাছে টেনে নেয়। আমরা জনপ্রিয় ধারণায় জানি - হিজড়ে সন্তান জন্ম হলে হিজড়েরা তালি দিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়! এই সমস্ত রহস্য হিজড়েরা মানুষের মনে জিইয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে কল্পনার কোনো স্থান নেই, এমনকি গবেষণামূলক উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থনে কোনো কোনো ঔপন্যাসিক এই সত্যতাগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, যেমন মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা* উপন্যাস। হিজড়ে বাচ্চা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ধারণাটিই আসলে ভিত্তিহীন, এই ধরনের কোনো প্রথা হিজড়ে সংস্কৃতিতে নেই। হিজড়ে সমাজের অন্দরমহলে প্রবেশ করে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতা নিয়ে রচিত হিজড়ে সম্পর্কিত উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই কম। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত কবিতা সিংহের *পৌরুষ* উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের প্রথম বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ভর পূর্ণাঙ্গ হিজড়ে সম্পর্কিত উপন্যাস। তবে এর পূর্বেও নারীসুলভ পুরুষ চরিত্র নানাভাবে বাংলা সাহিত্যে উঠে এসেছে। যেমন *হাসুলি বাঁকের উপকথার* নসুবালা চরিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নসুমামা ও আমি* গল্প, *মায়ামৃদঙ্গের* শান্তি সুবর্ণদের মতো নাচিয়ে ছোকরাদের জীবনকাহিনি ইত্যাদি। কিন্তু নারী-পুরুষ বিষমকামী সমাজের মধ্যেও হিজড়েরা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বাহক সে বিষয়ে প্রথম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে *পৌরুষ* (১৯৮৪) উপন্যাস। এরপর একই বছরে প্রকাশিত পর পর দুটি হিজড়ে বিষয়ক উপন্যাস হল কমল চক্রবর্তীর *ব্রহ্মভার্গব পুরাণ* (১৯৯৩), মানব চক্রবর্তীর *সন্তাপ* (১৯৯৩)। পরবর্তী সময়ে হিজড়ে জীবনের খুঁটিনাটি রোজনামচা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে রূপান্তরিত মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর *অন্তহীন অন্তরীন প্রোষিতভর্তৃকা* প্রকাশ পায় ২০০২ সালে। আবুল বাশারের *নরম হৃদয়ের চিহ্ন* (২০০১)-তে এর আগেই 'মালিয়া' নামে এক হিজড়ে একটি গৌণ চরিত্র হিসেবে এলেও এই চরিত্র হিজড়ে সমাজের একটি বিশেষ দিক উন্মোচন করে। হিজড়ে এবং উভলিঙ্গ চরিত্রকে পাশাপাশি রেখে লেখক বৈজ্ঞানিক দিকটিকেও স্পষ্ট করেছে। এরপর হিজড়ে সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞান ও দীর্ঘ গবেষণার প্রকাশ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *হলদে গোলাপে* (২০১৫)। বলা যায় স্বপ্নময় হলেন মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি। এই আখ্যানগুলিতে আমরা একটি সাধারণ ঘটনা বার বার লক্ষ করেছি, হিজড়েদের মহল্লাতেই কোনো না কোনোভাবে পৌঁছে যাচ্ছে এই নারীসুলভ পুরুষেরা, মূলত বয়ঃসন্ধির পর সামাজিকভাবে যখন অস্তিত্বের সংকট চরমে পৌঁছচ্ছে তখনই হিজড়ে মহল্লায় আশ্রয় নিতে নিজেরাই পৌঁছে যাচ্ছে গুরুমায়ের কাছে। ডোরাইসামির বয়স তখন চোদ্দ পনের বছর, তার জীবনেও এর ব্যত্যয় হয়নি। ডিন্ডিগুল পৌঁছনোর পর আম্মা শিখিয়ে দেয় বড়দের কীভাবে 'পাম্পাদুথি' সম্বোধনে সম্মান জ্ঞাপন করে পা ছুঁইয়ে প্রণাম করতে হয়! এই আখড়ায় এসে ডোরাইসামির জীবন বদলে গেল, নতুন নাম পেল রেভেথি, নিজেকে পূর্ণাঙ্গ নারী ভেবে গর্ব অনুভব করলো সে, 'I looked at myself in the mirror and felt a glow of pride.'[২] রেভেথি জেনেছে, মন আর শরীরের মিল করাতে তাকে 'নির্বাণাম' অর্থাৎ লিঙ্গচ্ছেদ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। পুরুষ চিহ্ন থেকে মুক্তির এই একমাত্র পথ। শর্ত একটিই, গুরুর অধীনে এক দু'বছর মহল্লায় থেকে নাক কান ফুটিয়ে চুল বড়ো করে টাকা রোজগার করে শিষ্য হিসেবে গুরুর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারলে তবেই গুরু রেভেথিকে নির্বানামে সাহায্য করবে। এই বিশেষ উৎসবে রেভেথির মতো আরও অনেক নারীভাবের পুরুষ ছিল যারা আম্মার শিষ্য হওয়ার জন্য এসেছে, তবে সবাই শিষ্য হওয়ার যোগ্য এমনটা নয়। এই প্রথম ব্লাউজের তলায় ব্রা পরে, মাথায় নারীদের মত পটচুলা

লাগিয়ে শাড়ি পরে রেভেথি উৎসবে আসা বড়দের আপ্যায়নে হাত লাগালো, গ্রামের গৃহবধুদের মত কোমরে জল ভর্তি কলসি নিয়ে হাঁটল, উৎসবের পর বড়দের জামাকাপড় কেচে দিল, এই প্রতিটি কার্যকলাপে গুরুমায়ের সুচারু দৃষ্টি আছে তা রেভেথি জানে। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে নিঃসন্দেহে সে শিষ্য হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই ঐতিহ্য ও নিয়মগুলি হিজড়ে সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাতে গুরুমার কাছে শুয়ে রেভেথি জেনে নেয় নির্বাণ হওয়ার আগে পর্যন্ত কীভাবে দেহের সেই বাড়তি অংশটি অর্থাৎ পুরুষাঙ্গকে কৌশলে লুকিয়ে রাখতে হবে! সমাজ হিজড়েদের শাড়ির তলায় পুরুষাঙ্গ দেখে ফেললে তা হিজড়ে সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক বিষয়। গুরুমা বলেন, 'They see us as woman, so make sure that you don't let it dangle.'[৩]

এই উৎসবের দিন সন্ধ্যেয় হিজড়েদের প্রত্যেকে সিল্কের শাড়ি পরে চুল বেঁধে মাথায় ফুল গুঁজে মন্দিরের দিকে যাত্রা শুরু করে, হাতে থাকে ময়দা দিয়ে তৈরি একটি প্রদীপ আর থাকে কিছু শস্যদানা। রেভেথি দেখেছে এ যেন এক ভিন্ন জগৎ, এখানে কেউ তাদের বিরক্ত করার নেই, এখানে প্রয়োজন নেই নারীত্বকে লুকিয়ে রাখার। মন্দিরে জড়ো হয়ে বিশেষ গানের মধ্যে দিয়ে 'গুম্মি' নাচ করা এই আম্মাম উৎসবের একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। রেভেথির শিষ্য হওয়ার পদ্ধতি তাঁর এই আত্মজীবনীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। এই অংশে এসে বোঝা যায় ভাষা সংস্কৃতি ও এলাকাগতভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিজড়েদের নিজস্ব কিছু মৌলিক রীতিনীতি থাকে, যা দেশের অন্যপ্রান্তের হিজড়ে সংস্কৃতি থেকে আচারগত দিক দিয়ে কিছুটা আলাদা। রেভেথি লিখছেন, সেই উৎসবের দিন রাতে হিজড়ে দলের সমস্ত সদস্য এক জায়গায় হয়ে সিদ্ধান্ত নিল রেভেথিকে শিষ্য করবেন আম্মা। একটি থালার ওপর সাদা পরিষ্কার কাপড় পেতে তার চারপাশ ঘিরে সবাই বসলেন, এরপর আম্মার গুরুর নাম উচ্চারণ করে বংশ বা পরিবারের নাম স্মরণ করে বলা হল আজ থেকে রেভেথি আম্মার চেলা। সে সাদা কাপড়ের ওপর একটা পানপাতা রেখে তাতে দেওয়া হল ১ টাকা ২৫ পয়সা। এরপর রেভেথির গুরু রেভেথির নামে দিল ৫ টাকা আর ওই ১ টাকা ২৫ পয়সা জামাতের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলো। প্রত্যেকে একসঙ্গে উচ্চস্বরে তালি দিয়ে বললো রেভেথির নামে গুরু দিলেন ৫ টাকা 'থাড়ু' অর্থাৎ অর্থমূল্য। এরপর সবাই পাম্পাদুথি সম্বোধন করে বড়োদের পা ছুঁইয়ে, সমবয়স্কদের সঙ্গে কোলাকুলি করে সমাপ্তি হল চেলা করার অনুষ্ঠান। সাধারণত চেলা করার পরবর্তী সময় থেকে পাকাপাকিভাবে খোলে থাকার নিয়ম। এরপর নতুন চেলাকে হিজড়ে সমাজের আদব কায়দা আচার অনুষ্ঠান নিয়মরীতির পাঠ দেওয়া হয়, কিন্তু আমরা দেখি রেভেথির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। রেভেথির গুরু তাকে একটা ভালো কাজ খুঁজে আপাতত গ্রামে থাকার পরামর্শ দেয়। তবে গ্রামে ফিরে গিয়ে টিকে থাকতে পারেনি সে, কোনোরকমে পালিয়ে এসেছে দিল্লিতে আম্মার কাছে। দিল্লিতে হিজড়ে সংস্কৃতির স্বরূপ বদলে গেছে, এখানে হিজড়েদের কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের কিছু বিশ্বাস আছে, যেমন, সকালে হিজড়ে দর্শনে দিন ভালো যায়, হিজড়েদের আশীর্বাদে ব্যবসার উন্নতি হয়, হিজড়েরা অভিশাপ অথবা আশীর্বাদ দিয়ে যা বলে তা সত্যি হয়ে যায়, ইত্যাদি। রেভেথি বলছেন, "In this Delhi, for centuries, they've treated us like gods. They fall at our feet and seek our blessings. Our word is considered all-powerfil and whatever we say comes true. When we go to shops, we clap hands and say 'Ramramji! Namaste babu! And they give us money, a rupee or 5 rupes, or whatever they want to give. We accept this money, place our palms on the shopkeeper's head and say 'Be well! We hope your business goes well."[৪] হিজড়ে সমাজের নিয়মরীতির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রীতি হল পান দিয়ে গুরুকে সম্মান জানানো। যতবার পান দেবে ততবার তুকতানি (পানের পিক ফেলার দানি) সহকারে গুরুকে পাম্পাদুথি বলে সম্মান জানানো হিজড়ে সংস্কৃতির প্রাচীন প্রথা।

আমরা দেখেছি রেভেথিকে আম্মা পরামর্শ দিচ্ছেন হিজড়েদের মূল পেশা 'বাধাই' সম্পর্কে, যার অর্থ ভিক্ষা করে টাকা রোজগার করা। বিভিন্ন দোকানে বাসে রাস্তার মোড়ে এবং বাচ্চা নাচিয়ে টাকা চাওয়ার এই সামগ্রিক উপায়কে বলা হয় বাধাই। কিন্তু হিজড়ে ভিক্ষে চাইলেই সাধারণ মানুষ ভিক্ষে দেবে কেন! এর নেপথ্যে রয়েছে হিজড়ে সমাজ সম্পর্কে সাধারণ মানসে রহস্যময়তা আর ভীতি। এই ভীতি প্রসঙ্গে আম্মা রামায়ণের কাহিনি শোনান - বনবাসে যাওয়ার সময় রাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে ফিরে যেতে বলেন, কিন্তু চৌদ্দ বছর বনবাস জীবন কাটিয়ে রাম যখন অযোধ্যায় ফিরছেন, তখন দেখেন নদীর ধারে কিছু মানুষ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে রঘুবীরকে তারা জানান তিনি নারী ও পুরুষকে ফিরে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু এই কিন্নর সমাজ অর্থাৎ যারা না নারী না পুরুষ তাদের ফিরে যেতে বলেননি বলে তারা চৌদ্দ বছর ধরে রামের অপেক্ষা করছে। রাম অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বলেন - এই কিন্নরসমাজ মুখ দিয়ে যা বলবে তৎক্ষণাৎ তা ফলে

যাবে। এই রামায়ণের কাহিনি নিশ্চয়ই লোকমুখে যুগ যুগ ধরে ঘুরে চলেছে, আর সেই কারণেই সাধারণ মানুষ আজও বিশ্বাস করে হিজড়েদের অভিশাপ লেগে যায়। এই ভীতি থেকে সাধারণ সমাজ হিজড়েদের ভিক্ষা না দিয়ে ফিরিয়ে দিতে ভয় পায়।

'Hijras have their own rules, culture and rituals'[৫] – রেভেথি নানগুরুর (দিদা) বাড়িতে থাকার সময় দেখেছে দিল্লির তুলনায় মুম্বাইয়ে হিজড়ে খোলের নিয়ম অনেকখানি আলাদা, এখানে হিজড়ে যৌনকর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। যারা বাধাইয়ের কাজ করে তাদের যৌনপেশার কাজ করতে হয় না। মুম্বাই শহরে হিজড়ে খোলে চেলা অথবা শিষ্য করার নিয়মও দিল্লি থেকে আলাদা। পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কোনো হিজড়ে যদি কাউকে চেলা বানাতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে জামাতের কাছে নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়ে জামাতের অনুমোদন আদায় করতে হবে। মুম্বাই শহরে থাকতে গেলে রেভেথিকে প্রথমত, মুম্বাই এলাকার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে, আর দ্বিতীয়ত, অপারেশান করিয়ে পুংলিঙ্গ থেকে মুক্তি পেতে হবে। একজন গুরু থাকতেও রেভেথিকে মুম্বাইয়ে এসে মুম্বাইয়ের হিজড়েদের নিয়ম ও ঐতিহ্যানুযায়ী আবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে! আমাদের মনে হয় এর সঙ্গে হিজড়েদের জীবিকা উপার্জনের দিকটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তির অধিকার পেতে গেলে উক্ত এলাকার হিজড়ে মহল্লার কোনো গুরুর চেলা হয়ে গুরুর অধীনে বসবাস করতে হবে, নইলে হিজড়ে সমাজের কেউই তাকে এলাকায় কাজ করতে দেবে না। রেভেথি জেনেছে একজন হিজড়ের একাধিক রাজ্যে গুরু থাকতে পারে। মুম্বাইয়ের গুরুমা ঠিক করেছেন তাঁরই চেলার চেলা হবেন রেভেথি। হিজড়ে সমাজে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, দুজন চেলা হতে ইচ্ছুক হিজড়ে সমবয়স্ক হলেও যে আগে দীক্ষা নেবে সেই আসলে সম্মান ও সম্পর্কের বিচারে বড় হবে। মুম্বাইয়ের বাইকুল্লা শহর, যেখানে হিজড়েদের সাত পরিবার বা ঘরানার নায়েকরা মাটিতে একসঙ্গে বসে রেভেথিকে প্রথমে জিজ্ঞেস করে নেয় যে সে এর আগে মুম্বাই এলাকার কোনো গুরুর চেলা হয়েছে কিনা! উত্তরে রেভেথি জানায় সে হল 'ঘোরি মুরাথান' অর্থাৎ মুম্বাই এলাকায় সে প্রথমবার চেলা হচ্ছে। সমস্ত নায়েকের সামনে হিজড়েরা রেভেথির কথাগুলো আবার উচ্চস্বরে তালি দিয়ে ঘোষণা করার পর মিষ্টিমুখ দিয়ে এই শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ হয়। এরপর রেভেথিকে দেওয়া হয় নতুন পোশাক, একটি বাক্স আর ঘুমানোর জন্য বিছানা। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে হিজড়ে খোলের নতুন চেলাদের দায়িত্ব নেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্তিয়া সম্পন্ন করা হল। এই পুরো অনুষ্ঠানকে মুম্বাইয়ের হিজড়েরা বলেন 'রিথ' (Reeth)।

'নির্বাণাম' অর্থাৎ পুরুষ লিঙ্গ বাদ দেওয়ার দুটি পদ্ধতি – থায়াম্মা (Thayamma) অর্থাৎ হিজড়েদের হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে অপারেশান করা আর হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে অপারেশান। থায়াম্মা অপারেশান অবশ্যই বেশি যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু এই পদ্ধতি অপারেশান হলে হিজড়ে সমাজে সম্মান বেশি। রেভেথির গুরু ঠিক করেছে হাসপাতালে রেভেথির 'নির্বাণাম' সম্পন্ন হবে। ১৯৮৬ সালে এই অপারেশানের জন্য খরচ হত ইঞ্জেকশান ও ওষুধ বাদে ২৫০০ টাকা, গুরুরাই সাধারণত এই খরচ বহন করে থাকেন। নির্বাণামে যাওয়ার আগে দেবতার সামনে কিছু আচার নিয়ম পালন করে ঘর থেকে বেরনোর নিয়ম। হিজড়েদের দেবতা পথিরাজা মাতার সামনে নির্বাণামে অংশগ্রহণকারী হিজড়েকে প্রথমে দেবতার সামনে একটি নারকেল ভেঙে কর্পূর ও ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে হবে। এরপর গুরু এক খণ্ড হলুদ কাপড়ে ১ টাকা ২৫ পয়সা দিয়ে সেটি শিষ্যের হাতে বেঁধে দেবেন এবং সঙ্গে দেবেন নারকেল ও লেবু। গুরুদের বিশ্বাস নির্বাণামের সময় এই সমস্ত কিছু তার চেলাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। নির্বাণের পর হাসপাতাল থেকে নতুন রূপে যখন হিজড়ে খোলে প্রবেশ করে তখন খোলের গুরুজনেরা ধূপকাঠি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁকে বরণ করেন। রেভেথিকে নির্বাণের পর তাঁর নানগুরু যখন বলে 'Enter, you woman!'[৬] তখন আমরা বুঝে নিতে পারি হিজড়ে পরিবারে নারীর মতো হয়ে ওঠার এই চেষ্টাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। 'থায়াম্মা নির্বাণাম' কিংবা হাসপাতালে অপারেশানের মাধ্যমে নির্বাণ বা লিঙ্গকর্তন পদ্ধতির পর একজন হিজড়েকে চল্লিশ দিন কিছু নিয়ম-রীতি পালন করতে হয়। এই সময় আয়না দেখা, কোনো পুরুষের মুখ দেখা এবং চুল আচড়ানো বারণ থাকে। বড়দের পাম্পাদুথি সম্ভাষণের বাধ্যবাধকতা থাকে না। ক্ষতস্থানে প্রতিদিন বোরিক পাউডার দেওয়া হয় এবং পনেরো দিন ধরে ডাক্তার পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে থাকেন। অপারেশানের বারোদিন পর পাড়ার হিজড়েদের নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তাদের মাথায় সবাই জল ঢালেন। সেই দিনগুলোতে, সমবয়সিরা, বাড়ির বড়রা, তাদের শরীরে হলুদ মাখিয়ে আরতি করে মুখে চিনি দেয়। যারা নতুন নির্বাণ করা হিজড়েদের দেখতে আসে তারা গম, চিনি, ঘি এবং কখনও কখনও চা উপহার হিসেবে নিয়ে আসে। কুড়ি দিনের মাথায় আবার একই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন ক্ষত সেরে ওঠে এবং তারা পুনরায় ঘরের কাজে আগের মতো সাহায্য করে। চল্লিশতম দিনে তাদের দেহের বিশেষ কিছু অংশে - মুখ, পা এবং হাতে নারীত্ব ফুটে উঠতে থাকে। এই দিন প্রথমে হলুদ-মেহেদি অনুষ্ঠান হয়, তারপর মাতা বহুচেরা দেবীর পুজো করে নতুন হয়ে ওঠা নারীকে দূষণমুক্ত করতে হয়। রেভেথি বলেছেন এ যেন মেয়েদের

প্রথম মাসিকের পরের অনুষ্ঠান। চল্লিশ দিনের এই রীতি সম্পন্ন হলে তারা বাড়ি থেকে বের হতে পারেন। রেভেথির চল্লিশতম দিনের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল তাঁর নানির বাড়ি ভান্ডুপে, যা যৌন কর্মে নিবেদিত ছিল। এই সামগ্রিক অনুষ্ঠানের নাম 'হলদি-মেহেন্দি' (হিন্দু বিবাহসংস্কৃতির অনুরূপ)। এইদিন রেভেথিদের সবুজ শাড়ি, ব্লাউজ ও সবুজ চুড়ি পরতে হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার ধনী হিজড়ে নায়েকেরা, রঙিন শাড়ি পরা হিজড়েরা, বয়স্ক ও কনিষ্ঠ হিজড়েরা এবং কিছু যৌনকর্মী এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছিল। রেভেথি এবং তাঁর গুরুভাইকে একটি পৃথক ঘরে বসানো হয়েছিল এবং বাইরে পাড়ার হিজরেরা গাইছিলেন খুশির গান। সারা রাত ধরে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। গভীর রাতে হলুদ আর মেহেন্দি দিয়ে নতুন হিজড়েদের অভিষিক্ত করা হয়। ভোর রাতে অন্য হিজড়েরা তাদের স্নান করিয়ে চুলের বেণী বেঁধে দিয়ে নতুন শাড়ি পরিয়ে দেন। নববধূর মতো ঘোমটা টেনে বহুচেরা মাতার সামনে বসতে হয় এবং শুরু হয় মুর্গামাতার স্তব। ধূপ আর কর্পূরের গন্ধে এক অদ্ভুত আবহের সৃষ্টি হয়, হিজড়েরা প্রত্যেকে উচ্চস্বরে বলেন 'জয় সন্তোষী মাতা!' হিজড়েদের বিশ্বাস বহুচেরা মাতা সন্তোষী মায়ের আরেক রূপ। এই সময় আবেগে ভরপুর হয়ে হিজড়েরা তালি দিয়ে মাতার স্তব করতে থাকেন। নির্বাণ হওয়া হিজড়েদের গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হয় এবং শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে গুজে দেওয়া হয় পানপাতা। এরপর মাথায় দুধের পাত্র নিয়ে নিকটতম কুয়োতে দুধ ঢালতে হয়, তবে মাথা থেকে পাত্র নিচে নামানো যায় না। এই ক্রিয়া সম্পন্ন হলে পাত্র পূর্ণ করে জল নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়। ঘরে ফিরে ঘোমটা উন্মোচন করে বহুচেরা মাতার রূপ দর্শন করে মাতাকে প্রণাম করে চল্লিশ দিন পর তারা আয়না দর্শন করে। আয়না এমনভাবে ধরতে হয় যাতে মাতা ও নির্বাণ হওয়া হিজড়ের মুখ একসঙ্গে দেখা যায়। রেভেথি নির্বাণের চল্লিশ দিন পর আয়নায় নিজের মুখ দেখে বলেন, 'My face had changed! I felt like a flower that had just blossomed. It seemed to me that my earlier male form had disappeared and in its place was a woman.'[৭] এরপর মুর্গামাতার ছবির সামনে স্তূপীকৃত ফলের মধ্যে থেকে রেভেথিদের যে কোনো একটি ফল তুলে খেতে বলে। রেভেথি একটি ফল তুলে খাওয়ার পর উপস্থিত সমস্ত হিজড়ে একসঙ্গে চিৎকার করে বলে, 'সিসা! সিসা!' এর পর, বাকি সবাই তাদের প্রিয় খাবারের খোঁজে খাবারের স্তূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিজড়েরা বিশ্বাস করেন নতুন নির্বাণ হওয়া হিজড়েরা যে ফল খাবে তাদের ভবিষ্যৎ তেমনই হবে। হিজড়েদের বিশ্বাস এই দিন যারা মিষ্টি ফল বেছে নেয়, তাদের জীবন সুখের হয়। কেউ আগে থেকে এই ব্যাপারে বলে না, তাই রেভেথিরা অনেকেই জানত না প্রথমে কী খেতে হবে। রীতি সম্পন্ন হওয়ার পর সকলকে পামপাদুথি সম্ভাষণ করে সম্মান জানানো হয় এবং প্রত্যেকে লিঙ্গ প্রত্যাহার করা হিজড়েদের আশীর্বাদ করে থাকেন।

নির্বাণামের পর গুরু শিষ্যকে কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যেমন - প্রকাশ্যে স্কার্ট তোলা যাবে না, হিজড়েদের নিয়মগুলি সম্মান করতে হবে এবং তা মানতে হবে। এখন থেকে একজন মহিলার মতো আচরণ করতে শিখতে হবে। চুল কাটা, বাড়ি থেকে পালানো - এসব কিছুই অনুমোদিত নয়। দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করলেও তাকে অহংকার দেখানো যাবে না! হিজড়েরা নারীদের মতো বাঁচতে চায়, সেই কারণে নির্বাণ হওয়া নারী সদৃশ যৌনাঙ্গ কাপড় তুলে বিশ্বকে প্রদর্শন করা হিজড়ে সমাজ নারীসত্তার অপমান বলে মনে করেন। ভান্ডুপ বাড়ির বড় মহিলারা রেভেথিদের 'পিঞ্জু' বলে সম্বোধন করত কারণ তাঁরা এখন কোমল এবং যুবতী। আর বয়সে ছোট মেয়েরা 'আম্মা' বলত। এরপর রেভেথিদের দেওয়া হয় 'জোক' অর্থাৎ আশীর্বাদী পোশাক। সবুজ পোশাক খুলে এবার পরে নিতে হয় এই জোক পোশাক। এই পোশাক নির্বাণ হওয়া হিজড়েদের একদিনের জন্য পরতে হয়। পরের দিন এই পোশাক পরে পরিবারের একজন আকুয়া হিজড়ে, যার এখনো নির্বাণ হয়নি। হিজড়েরা বিশ্বাস করেন যারা এখনও নির্বাণাম পায়নি তারা এই পোশাক পরলে তাড়াতাড়ি নির্বাণ পাবে। অর্থাৎ বহুচেরা মাতা তাদের উপরও অবতরণ করবেন। পরিবার সম্পর্কে যদিও আমরা বর্ণ বা ধর্মীয় পার্থক্য করি না, তবে হিজড়ে সমাজে পরিবারের অভ্যন্তরে বিরোধ আছে। হিজড়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সবসময়ই নারী হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতা চলে। নানির বাড়িতে রেভেথি কড়া নিয়মের মধ্যে থাকলেও অল্পদিনেই সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ কারণে মাত্র ছ'মাস যেতেই রেভেথির নির্বাণের ব্যবস্থা হয়, অন্য হিজড়েদের ক্ষেত্রে তা অনেক সময় তিন বছরও পেরিয়ে যেতে পারে। হিজড়েদের বিশ্বাস বহুচেরা মাতা তাদের উপর অবতরণ না করলে এটি কখনো হয় না। কখন এটি সম্পন্ন হবে তা গুরুমাতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

রেভেথি শুধুমাত্র যৌনজীবন উপলব্ধি করার জন্য প্রথম গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করেছিল। একুশ বছর বয়সে নির্বাণ হওয়ায় রেভেথির শরীরে যুবতী নারীর সমস্ত চিহ্ন ও চাহিদা যেভাবে তীব্র হতে থাকে তা একজন নারীর জৈবিক চাহিদার মতোই। যৌনতা অনুভব করার জন্য রেভেথির যৌনপেশায় যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে আমাদের বিস্মিত করে। যে গুরু রেভেথিকে নির্বাণের মধ্যে দিয়ে নারী করে তুললো তার ছত্রছায়া ত্যাগ করে অন্যত্র যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশ্বাসঘাতকতার সমান, যা পরবর্তীকালে রেভেথি

নিজেও উপলব্ধি করেছে। রেভেথি স্বীকার করে সে নতুন গুরুর চেলা হয়েছিল শুধু যৌনসুখের আকাঙ্খা পূরণের জন্য– 'My heart alone knew the truth of all this: that when I was at my nani's place, they had looked after me well. I lacked for nothing. I became a chela to my new guru because of my desire for sexual happiness, in order to fulfill my sexual longings'[b] রেভেথি যখন নতুন গুরুর চেলা হয়েছিল তখন তার ওপর প্রথম গুরু বা নানির কোনো দাবি ছিল না। গুরু বদল করলেও নতুন গুরু একাধিক হিজড়ের উপস্থিতিতে বার বার জিজ্ঞেস করে নেয় যে সে পুরনো গুরুর কাছে ফিরে যেতে চায় কিনা! কিংবা সে নিজে থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা! এ সময় সিদ্ধান্ত বদলালে হিজড়েরা সেই সিদ্ধান্তের সম্মান করে থাকেন। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য গুরুর চেলা হতে চায়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার কাছে আগের গুরুর বাড়ি থেকে আনা কিছু আছে কি না অথবা কারও কাছে তার কোনো ঋণ জমা আছে কি না। যদি পরেরটা সত্যি হয়, তাহলে তারা পুরনো ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবেন নতুন গুরু। এই সমস্ত কিছু সাতজন নায়েকের তত্ত্বাবধানে ঘটে যারা একত্রে বসে এই ধরনের বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেয়। রেভেথির নতুন গুরু তার নির্বাণামের ব্যবস্থা করা গুরুর পরিবারকে একশো পঞ্চাশ টাকা পরিশোধ করে তাকে নতুন গুরুর চেলা ঘোষণা করা হয়েছিল।

হায়দ্রাবাদে, চেলা হওয়ার আগে, হিজড়ে সম্প্রদায়ের নায়েকরা রেভেথিকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে আগে কারো চেলা ছিল কিনা, এবং যদি তাই হয়, কোন বাড়িতে এবং কখন সে নির্বাণ করেছে ইত্যাদি। মুম্বাইয়ে যে বাড়িতে রেভেথির নির্বাণের ব্যবস্থা করেছিল তার পরে সে মাটুঙ্গায় কারো কাছে চেলা হয়েছিলেন এবং তারপর আবার প্রথম গুরুর কাছে ফিরে গেছেন। সুতরাং, কার্যত রেভেথি তিনবার চেলা হয়েছে। হায়দ্রাবাদের গুরুর কাছে চেলা হওয়ার আগে হিজড়ে প্রথানুযায়ী গুরু জিজ্ঞেস করেন পুরনো গুরুর বাড়িতে টাকা বা গয়না ঋণ আছে কিনা! বার বার এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ হিজড়েরা বিশ্বাস করেন শিষ্যের যদি পুরনো গুরুর কাছে কোনো ঋণ থাকে তাহলে সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব নতুন গুরুর। হায়দ্রাবাদের নতুন গুরুকে রেভেথির জন্য জামাতকে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হয়েছে। রেভেথির প্রাক্তন গুরুকে, যিনি তাঁর নির্বাণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং রেভেথির যে গুরু তাকে তার চেলা বানানোর জন্য যে ডান্ডা (যৌনব্যবসা) টাকা দিয়েছিলেন তাও তাকে মেটাতে হয়েছিল। জরিমানা পরিশোধের পরই তারা রেভেথির জন্য চেলা অনুষ্ঠান করে, জামাতকে চার টাকা দেওয়া হয় এবং তারা নতুন বাড়ির নাম, বাড়ির নায়েক এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারের নাম বলে; চেলা হতে চাওয়া হিজড়ের নাম এবং গুরুর নামও ডাকা হয়।

তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম জেলার কুভাগামে অবস্থিত কুথান্দাভার মন্দির। প্রতি বছর চিতরাই মাসে (এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি) পূর্ণিমার দিনে সেখানে একটি উৎসব হয় এবং হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়। পুরুষ ও হিজড়ে-মহিলারা এই আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেয় এবং আরাবানের উদ্দেশ্যে থালি (মঙ্গলসূত্র) বাঁধার প্রতিজ্ঞা করে। পরের দিন রাস্তার মধ্য দিয়ে টানা হয় এবং আনুষ্ঠানিক বলিদানের পরে, তারা তাদের চুড়ি ভেঙে দেয় এবং তাদের থালি ছিঁড়ে ফেলে। এই সময় আরাবানীরা উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদতে থাকেন এবং সাদা শাড়ি পরে বিধবা বেশে তিন দিন থাকেন। গরীবদের খাওয়ানোর পর আরাবানীরা পুনরায় সধবা বেশে বাড়ি ফেরেন। মহাভারতের ঘটনার সূত্র ধরেই উৎসবের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা যাতে মহাযুদ্ধে জয়ী হয় তার জন্য এমন একজন যুবককে বলি দিতে হবে যে সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত। শুধুমাত্র তিনজন পুরুষকে নিখুঁত বলে মনে করা হত, অর্জুন, কৃষ্ণ এবং আরাবান অথবা ইরাবান। আরাবান ছিলেন অর্জুনের পুত্র এবং নাগ রাজকন্যা উলুপীর সন্তান, সে বলিদানে সম্মত হন। বলিদানের বেদীতে পা রাখার আগে, সে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে যে সে একজন মহিলাকে বিয়ে করতে চায় এবং ক্ষণস্থায়ীভাবে, দাম্পত্য সুখ উপভোগ করতে চায়। যেহেতু কোনো নারী আরাবনকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসেনি, তাই কৃষ্ণ একজন নারী, মোহিনীর রূপ ধারণ করেন এবং আরাবনকে বিয়ে করেন। এক দিন দাম্পত্য সুখের পর, আরাবান যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করে। বলিদানের পর, তার স্ত্রী মোহিনী (কৃষ্ণ) তার মৃত্যুতে বিলাপ করে এবং বিধবার পোশাক ধারণ করে। আরাবানের এই জীবন উৎসর্গের স্মৃতিতে সমস্ত জায়গা থেকে হিজড়েরা কুভাগামে এসে উৎসব পালন করে। উৎসবের এক সপ্তাহ আগে কুভাগামে জমায়েত হতে শুরু করে এবং ভিলুপুরম ও আশেপাশের লজ এবং হোটেলগুলিতে ঘর ভাড়া নেয়। হিজড়েদের মিলন, স্নেহের আলিঙ্গন বিনিময়, নতুন পোশাক পরা, জনসম্মুখে নিজেদের প্রকাশ করা, দীর্ঘপথ হাঁটা ইত্যাদির মাধ্যমে কুভাগামে যে উৎসব পালিত হয় তা প্রতিটি হিজড়ের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। থালি বাঁধার আচারের আগের দিন, কয়েকটি এনজিও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, গান ও নাচের প্রতিযোগিতা এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার পোশাক কেনার জন্য অনেকদিন আগে থেকেই হিজড়েরা টাকা জমানো শুরু করে। এই প্রতিযোগিতার মঞ্চের পাশে বসে তাদের বন্ধু, গুরু এবং গুরুবোনেরা উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এছাড়াও এই

উৎসবে ভিড় করে - সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক, দেশ-বিদেশের গবেষক এবং সাধারণ মানুষ। রেভেথি একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পুরস্কার জিতেছিলেন।

আরাবানী সমাজে, গুরুই তার চেলাদের দেখাশোনা করেন, যখন কোনো গুরু মারা যান, মনে করা হয় চেলারা যেন বিধবা হয়ে গেল এবং তার জন্য বৈধব্য দশা পালন করে – রেভেথি বলেন এটাই তাদের হিজড়ে সমাজের রীতি ও অভ্যাস। হিজড়ে পরিবারের কেউ মারা গেলে হিন্দু সমাজের অশৌচ পালনের মতো চল্লিশ দিন সাদা পোশাক পরে বিধবার বেশে থাকতে হয়। রেভেথির গুরু মারা গেলে একটি মণ্ডপে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সকালে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতিতে পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে গুরুর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং দরিদ্রদের খাওয়ানো হয়। সব ঘরানার আরাবানীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। আরাবানীরা শোককৃত্যের যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান করে তা 'রাউন্ডাপ' (Roundap) নামে পরিচিত এবং এই শেষকৃত্য মুসলমান ধর্মমত মেনে করা হয়[৯]। যারা রাউন্ডাপ করে (অর্থাৎ চল্লিশ দিনের অশৌচ পালন করে) তারা এই বিধবাবেশী আরাবানীদের রঙিন শাড়ি দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে টাকা দান করে বিধবাদের কোলে ফেলে দেন। রঙিন শাড়িটি যিনি দিচ্ছেন তিনি তার নাম, পরিবারের নাম, বাড়ি এবং সে যে নায়েকের ঘরানার হিজড়ে – সে সমস্ত উচ্চারণ করে থাকেন। রেভেথির গুরুর শেষকৃত্যে রাউন্ডাপের এই অংশটি শেষ হওয়ার পরে, কালাগুরু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে তিনি এখন থেকে সবার গুরু; তিনি পাশে দাঁড়াবেন, সাহস দেবেন এবং পরিবারের সকল সদস্যকে সান্ত্বনা দেবেন। এখন থেকে কেউ নিজেকে সুমঙ্গলী বা বিধবা মনে করতে পারে, কিন্তু সেটা তার ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। রেভেথি তাঁর গুরুর স্মরণে পায়ের আংটি আর কাঁচের চুড়ি পরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে রেভেথি যে সমস্ত 'উল্টি' (হিজড়েদের গোপন ভাষা) শব্দ ব্যবহার করেছেন, আমরা তার একটি তালিকা তৈরির চেষ্টা করেছি -

তহজিস (Thozhis) – বন্ধুস্থানীয়/ সহযোদ্ধা/ গোতিয়া শব্দের অনুরূপ অর্থ

পোত্তাই (Pottai) – নারীসুলভ পুরুষ/ কোতি শব্দের অনুরূপ অর্থ

চেলা (chela) – শিষ্য

নাথি (nathi) – শিষ্যর শিষ্য

নানি (Nani) গুরুর গুরু

ডান্ডা (Danda) – পুরুষের যৌনাঙ্গ

পাম্পাদুথি (Paampaduthi) – সম্ভাষণ/ সম্মান জ্ঞাপন/ 'পায়ে লাগু' শব্দের অনুরূপ অর্থ

নির্বাণাম (Nirvaanam) – পুরুষাঙ্গ ছেদন/ পুরুষাঙ্গ থেকে মুক্তির পদ্ধতি

জামাত (Jamaat) – দল বা গোষ্ঠী/ হিজড়ে সমাজ

থান্ডু (Thandu) – অর্থমূল্য

তুকতানি (Tooktani) – পানের পিক ফেলার পাত্রবিশেষ

ঘোরি মুরাথান (Ghori murathan) – প্রথমবার হিজড়ে হওয়া (দাগ খাওয়া শব্দের অনুরূপ অর্থ)

রিথ (Reeth) – চেলা করার অনুষ্ঠান

পান্থি (Panthi) – স্থায়ী প্রেমিক/ সঙ্গী (পারিক শব্দের অনুরূপ অর্থ)

জিমিট্টা (Jimitta) – চিমটে জাতীয় জিনিস

জোক (Jok) – উপহার সামগ্রী

দাই (Dai) – বয়সে বড় হিজড়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন/ সম্মানীয় হিজড়ে সদস্য

পিঞ্জু আম্মা/ পিঞ্জাম্মা (Pinjamma) – ছোট মা

পিঞ্জুস (Pinjus) – বয়স্ক হিজড়ে

আকুয়া পোত্তাইস (Akuva pottais) – আকুয়া হিজড়ে, লিঙ্গকর্তন হয়নি যে হিজড়ের

বাইরুপি (Byrupi) – অজ্ঞ। নিয়ম রীতি না জানা হিজড়ে

মাসোকা (Masoka) – অভিজ্ঞ হিজড়ে। ভালো হিজড়ে পরিবারের সদস্য

লাজ্জা (Lajja) – ওড়না

ডান্ডা (Danda) – যৌনপেশা

ডান্ডা কান্ত্রা (Danda kantra) – যৌনপেশার জন্য ব্যবহৃত বাড়ি

তথ্যসূত্র:

১. A. Revathi, *The Truth About Me, A Hijra Life Story Translated from Tamil by V Geetha.* (London : Penguin Books, 2009), Chapter Three.

২. তদেব, Chapter Three.

৩. তদেব, Chapter Three.

৪. তদেব, Chapter Five.

৫. তদেব, Chapter Five.

৬. তদেব, Chapter Ten.

৭. তদেব, Chapter Ten.

৮. তদেব, Chapter Twelve.

৯. তদেব, Chapter Twenty Nine.

Citation: **Karmakar. Dr. P..,** (2026) "একজন 'হিজড়ে'র আত্মকথন: একটি পর্যালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-02, February-2026.